

নাম: এস. এম সারফুউদ্দিন

জন্ম তারিখ: ২ মে, ১৯৬৯

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ব্যবসা

শাহাদাতের স্থান: বংশাল, ঢাকা

শহীদের জীবনী

যে পিতা স্বাধীনতা দেখে ফিরলেন না

নিশ্চয় চিত্তাকরে লেখা এক নাম এস. এম. সারফুউদ্দিন। তাঁর পরিচয় কোনো ঠান্ডা তথ্য নয়, কোনো খাতায় লেখা রেজিস্ট্রি নম্বর নয়। তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস, এক অনুভবযোগ্য ভালোবাসা। বাবা শরীফ মিয়ার ঘরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি বংশালের এক চিরচেনা মুখ ছিলেন, এক ছায়াদানকারী বৃক্ষ; যাঁর নিচে একটি ছোট পরিবার প্রতিদিন একটু করে বেঁচে থাকত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চলা একজন মানুষ, যিনি ছিলেন শুধুই সংসারের আয় উপার্জনকারী নন, তিনি ছিলেন হাসিমুখে দায়ভার নেওয়া একজন পিতা, একজন স্বামী, একজন বন্ধু, একজন সাহসিকতার প্রতীক।

২০০৬ সালে জীবিকার টানে বিদেশ পাড়ি দেন সারফুউদ্দিন। কাঁধে আশার পুঁটলি, পিঠে প্রিয়জনদের স্বপ্ন। কিন্তু ২০১১ সালে এক দুর্ঘটনায় সবকিছু থমকে যায়। শরীর আর আগের মতো চলে না, চলার গতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু স্ত্রী যেতে দেননি, ভালোবেসে বেছে নিয়েছেন নিজভূমে ফিরে আসার জীবন। কী আশ্চর্য এক ভালোবাসা! যেখানে প্রবাসের আরাম ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছেন দেশের ঘাম, পরিবারের গন্ধ, সন্তানদের হাসি। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া চলা সংসার, তবুও অভাবের অন্ধকারে আলো জ্বালানোর চেষ্টা চলত প্রতিদিন। দুই মেয়ে, এক ছেলে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে গড়া ছিল সেই জগৎ, যেখানে আহ্লাদ ছিল সীমিত, কিন্তু ভালোবাসার কোনো পরিমাপ ছিল না।

৫ আগস্ট ২০২৪। যেদিন ঢাকার রাজপথে ফুঁসে উঠেছিল “ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক!” স্লোগান, সেদিন সারফুউদ্দিন দাঁড়িয়েছিলেন সেই ঢেউয়ের মাঝে। প্রবীণ এক সংগ্রামী হয়ে তিনি হাঁটছিলেন স্বাধীনতার নতুন সকালের দিকে, চোখে ছিল দীপ্তির ছায়া, পায়ে ছিল দৃঢ়তার ভাষা। “মানুষ সম্পত্তি ফেলে এসেছে, কিন্তু প্রতিবাদ ছাড়েনি” এই কথাটা তিনি বলে গিয়েছিলেন সেদিন দুপুরে পরিবারের সঙ্গে খেতে খেতে। মাগরিবের পর আবার বের হয়েছিলেন, যেন মিছিলের গর্জনে নিজের শেষ নিঃশ্বাস মিশিয়ে দিতে চান। তিনি জানতেন না, এই যাত্রা হবে তাঁর জীবনের শেষ বিদায়।

রাজপথের কোলাহলে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটি ফিরে আসেননি আর কখনো। তিনি রয়ে গেছেন একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের ভেতর, একটি জাতির ঘুম ভাঙানোর শব্দের ভেতর। সারফুউদ্দিন এখন আর শুধু একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি প্রতীক, একটি কাঁপতে থাকা হৃদয়ের গল্প। শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা যে বিপ্লব, তার প্রথম অক্ষর যেন এস. এম. সারফুউদ্দিন। তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে নিজের শেকড় অস্বীকার করা। তাঁর মৃত্যু শুধু দেশের নয়, একটি বর্ণময় জীবনের মাইলফলক। তাঁর যাত্রা শেষ নয়, তিনি আমাদের পথচলার আলোর মতো, যিনি বলেন, “ভয় পেও না, সত্যের পথেই চলো!” এখনো যেন বাতাসে ভাসে তাঁর নিতীক কণ্ঠস্বর।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতার ভোর আর গুলির সন্ধ্যা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। এক অদ্ভুত দিন, যেন ইতিহাস নিজেই নিজের মুখ উল্টে ফেলে বলেছিল, “আজ জন্ম হবে কোনো এক নতুন দেশের, নতুন চেতনার।” সকালে সূর্য উঠেছিল যেমন করে উঠে প্রতিদিন, কিন্তু আলো ছিল ভিন্ন। সে আলোয় ছিল বিদ্রোহের দীপ্তি, মানুষের চোখে ছিল একরাশ অবিশ্বাস, আর বুকভরা আশার ধুকপুকানি। ঢাকা শহর যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল এক বিশাল জনসাগরে। পতাকা ওড়ছিল মানুষের হাতে, গান উঠছিল আকাশে, স্লোগানে কাঁপছিল শহীদ মিনার, টিএসসি, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অলিগলি।

সারফুউদ্দিন ছিলেন সেই শ্রোতের একজন। কোনো নেতার অনুগামী নন, ছিলেন নিজের বিবেকের সৈনিক। তিনি বলছিলেন, “মানুষ শুধু আনন্দ করছে না, তারা নিজেদের জীবনের নিশ্চয়তা ফেলে রেখেছে এই মাটিতে। কারণ তারা বুঝে গেছে, এটা আর ছাত্রদের আন্দোলন না, এটা এক জাতির আত্মপরিচয়ের লড়াই।” এই উপলব্ধি নিয়ে তিনি হেঁটে বেড়িয়েছিলেন শহরের প্রতিটি কোণে, যেখানে জনগণ একসঙ্গে শ্বাস নিচ্ছিল, যেন এই একই দিনে সবাই একটিই হৃদয়ের স্পন্দনে বেঁধে গিয়েছিল।

কিন্তু দুপুরের পর হাওয়া বদলাতে শুরু করে। সরকারি ভবনগুলো থেকে আসে ছায়ার মতো খবর বিরোধী পক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, ক্ষমতা হারিয়েছে, কিন্তু তারা ফিরবে। সেই ফেরা হবে নিঃশব্দে, ছদ্মবেশে, প্রতিশোধের মুখোশ পরে।

আর সারফুউদ্দিন? তিনি তখন নামাজে যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। পরিবারের কারো চোখে তখনও আতঙ্ক নেই, কারণ টেলিভিশনে তখনো চলছে বিজয়ের খবর “স্বাধীনতার মিছিল চলছেই!” ছোট ছেলে তাকিয়ে ছিল পর্দায়, যেখানে আনন্দ দেখা যাচ্ছিল, অথচ ঠিক সেই সময় বাস্তবতাটি বদলে যাচ্ছিল রাজপথে।

মাগরিবের আলো তখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। ঠিক তখনই গর্জে ওঠে প্রথম গুলি। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়। টিয়ারশেলের ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যায় সেই মানুষের মুখ, যিনি সেদিন সকালের আলোয় বলেছিলেন, “এই আন্দোলন জাতির।” সারফুউদ্দিন পড়ে যান রক্তাক্ত রাজপথে, তাঁর চোখের সামনে ভেঙে পড়ে সেই স্বপ্ন, যা তিনি বুকে নিয়ে এসেছিলেন শহীদ মিনার থেকে।

আর ঘরে? সন্তানরা তখনো জানে না, তাদের বাবা, যিনি বলতেন “ভয় পেও না, সত্যের পথেই চলো” তিনি আর ফিরবেন না। টেলিভিশনের পর্দায় স্বাধীনতার খবর চলছিল, কিন্তু জীবনের পর্দায় নেমেছিল এক গভীর শোকের পরিণতি।

এভাবে এক স্বাধীনতার ভোরের গল্প শেষ হয় গুলির সন্ধ্যায়। আর শহরের বাতাসে মিলিয়ে যায় সারফুউদ্দিনের নিঃশ্বাস একজন মানুষ, যিনি নিজের শেষ

মুহূর্তেও দাঁড়িয়েছিলেন সত্যের পাশে, ইতিহাসের শিরায় শিরায় গেঁথে দিয়ে গেছেন এক শহীদে নাম।

যেভাবে শহীদ হন

ঘটনার শুরু হয়েছিল এক সাধারণ সন্ধ্যায়। যেখানে একজন বাবা নামাজ শেষে একটু হেঁটে আসবেন, একটু আকাশ দেখবেন, হয়তো কোনো মিছিল দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসবেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যা আর ফিরতে দেয়নি সারফুউদ্দিনকে। এশার নামাজ শেষ করে তিনি বেরিয়েছিলেন মসজিদের দিকে। আকাশে তখন রাতের প্রথম তারা, কিন্তু মাটিতে নেমে আসছিল সংঘর্ষের আঁধার। পল্টন, প্রেসক্লাব, মিরপুর সবখানে ছড়িয়ে পড়ছিলো উত্তেজনা, মানুষ ছুটছিলো, পুলিশ তাগুব চালাচ্ছিলো, টিয়ারশেলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। সারফুউদ্দিন সেই উত্তাল সময়ের মাঝেই আটকে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই বাসা থেকে ফোন আসে ছেলে কাঁপা কণ্ঠে জানায়, “মা’র শরীর ভালো না, ওষুধ আনো।” বাবা ছুটে যান, হাতের কাছে যেটুকু পাওয়া যায় তা নিয়ে মামার হাতে ওষুধ দিয়ে নিজে আবার রাস্তায় বের হন। কেউ জানত না, ওই ফেরা হবে তার জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত। তখনই বাসার ভেতরে তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায় একটি, দুটি, তৃতীয়টি যেন স্থির করে দেয় ইতিহাসের পরিণতি। মা প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো বিজয়ের আতশবাজি। বাড়ির ছোট মেয়েটা হাসছিল তখনো, টিভিতে চলছিলো “সরকার পতন” নিয়ে বিশেষ খবর। কিছুক্ষণ পর এক অচেনা লোক এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, “সারফুউদ্দিন নামে কেউ আছেন? উনি গুলি খেয়েছেন।”

এই একটুখানি বাক্যে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একটি সংসারের পাথরের মতো শান্ত দালান। ছোট মেয়ে স্যাভেল ফেলে দৌড়ে নামেন সিঁড়ি, চোখে জল, কণ্ঠে কেবল একটাই শব্দ “বাবা...”। রাস্তার পাশে, যেখানে জ্যাম ফেঁসে ছিল, সেখানে পড়ে ছিলেন সারফুউদ্দিন শরীর রক্তে রঞ্জিত, চোখ অর্ধনির্মীলিত, কণ্ঠ নীরব। এলাকার কিছু চেনা মুখ তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায় নিকটস্থ হাসপাতালে। সবার মুখে তখন একটাই আশংকা “বঁচে আছেন তো?” কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার এক ঝলক দেখে শুধু বলেন, “তিনি আর নেই।”

তিনি ছিলেন এক পরিবারের ছায়া, এক প্রতিবাদের প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে যেন এই আন্দোলন নিজের সবচেয়ে ভারী মূল্যটা বুঝে নেয় রক্ত দিয়ে লেখা হয় সে পাতার নিচের শেষ চিহ্ন।

সেই রাতে ঘরে আলো ছিল, কিন্তু উষ্ণতা ছিল না। মা স্তব্ধ, ছেলে দেয়ালে মাথা ঠুকছে, মেয়েরা বিছানায় কাঁপছে। শহরের বিজয়ের হর্ণ বাজছিল, কিন্তু শহীদের ঘরে বাজছিল শূন্যতার এক দীর্ঘ রাত্রিকাল। তাঁর মৃত্যু হয়ে উঠল একটি জাতীয় আত্মত্যাগের প্রতীক। যেখানে আনন্দ আর অনন্ত শোক একে অপরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল, নীরব, অথচ চিরকালিক।

পরিবার ও পরবর্তী বাস্তবতা

আজ সারফুউদ্দিনের পরিবার বঁচে আছে, কিন্তু জীবন নয় এক মৃত্যুর ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে তারা কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যেন একটি দোতলা বাসার সব দরজা-জানালা খুলে গেছে, বাতাস ঢুকছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও উষ্ণতা নেই, আশ্রয় নেই। স্ত্রী আজও বিছানা থেকে পুরোপুরি উঠতে পারেন না। চোখে পানি নেই, কেবল এক নিরব, জমে থাকা শোক। ছোট মেয়ে, বিদ্যালয় ফেলে রেখে আজ মায়ের পাশে বসে থাকে সারাদিন। চোখের নিচে কালি, মনে ঘৃণা, মুখে নীরবতা। তার হাতে আজ আর খাতা-কলম নয়, মায়ের ওষুধ, বাবার শেষ ছবি, আর ছোট ভাইয়ের স্কুলের ব্যাগ। ছোট ছেলেটি, যে সবে ক্লাস সিলে ভর্তি হয়েছে, বাবার মৃত্যু মানে বোঝে না পুরোপুরি। তাদের জীবনের আশ্রয় ছিল যে ছোট ভাড়া ফ্ল্যাটে সেই ফ্ল্যাটের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন সারফুউদ্দিন। তিনি ছিলেন যে মানুষটা ঠিক সময়মতো বিল দিতেন, চাল-ডাল কিনে আনতেন, দেরিতে বাড়ি ফিরলেও মেয়ে-মায়ের খোঁজ রাখতেন, সেই মানুষটি আজ কেবল একটি ফ্রেমে বন্দি দেওয়ালে ঝুলছে, চোখ দুটি যেন জিজ্ঞাসা করে, “তোমরা কেমন আছো?”

পরিবারের কাছে সবচেয়ে কষ্টদায়ক মুহূর্ত ছিল এই তারা জানতই না যে গুলি সারফুউদ্দিনের গায়ে লেগেছে। কেউ দেখতে পায়নি তাঁর শেষ নিশ্বাস, কেউ ছুঁয়ে দিতে পারেনি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া হাত। কোনো শেষ বিদায় নেই, কোনো দাফনপূর্ব ওসিয়ত নেই; শুধু একদিন হঠাৎ জানতে পারা, বাবা আর নেই। সেই না-পারার যন্ত্রণাই আজ ঘিরে আছে প্রতিটি ঘরের দেয়াল।

এই মৃত্যু শুধুমাত্র এক হৃদয়বিদারক ঘটনা নয়, এটি একটি অসমাপ্ত সংসার। একটি পরিবার যেটা লড়াই করেছিল অল্পে খুশি থাকতে, সেটাই আজ হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। মেয়েটি এখন বলে, “যদি জানতাম, সেদিন বাবাকে নামতে দিতাম না।” কিন্তু ইতিহাস তো কোনো আগাম নোটিশ দেয় না। কোনো দিনপঞ্জিতে লেখা থাকে না, আজ রক্ত লাগবে। সারফুউদ্দিন সেই রক্ত দিয়েছেন যে রক্তে হয়তো স্বাধীনতার কোনোরকম রেখা টানা হয়েছে, কিন্তু সেই রেখা তাঁদের ঘরে কেবল শোক নিয়ে এসেছে।

এখন এই পরিবার শুধু বঁচে আছে। কারণ, তাঁদের প্রতিটি শিরায় বইছে সেই মানুষটির চিহ্ন, যিনি একদিন ঘর চালিয়েছিলেন ভালোবাসা দিয়ে, আর জীবন দিয়েছিলেন ন্যায়বোধে। তাঁরা আজও প্রতিবছর ৫ আগস্টের অপেক্ষা করেন, যেন সে দিন বাবা আসবেন, একবার শুধু বলবেন, “ভয় পেও না, আমি আছি।” কিন্তু জানেন, আসবে না কেউ। আসবে কেবল স্মৃতির দীর্ঘশ্বস, এক বাবার নাম, এক শহীদের গল্প।

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকার

এস. এম. সারফুউদ্দিন শুধু একজন শহীদ নন; তিনি ছিলেন হেঁটে যাওয়া এক প্রতিবাদপাঠ, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই যিনি গড়ে তুলেছিলেন ন্যায়, দায়িত্ব আর অন্ধকারকে ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে কেবল এক শোকবার্তা নয়, বরং জাতির সামনে ছুঁড়ে দেওয়া এক প্রশ্নপত্র, যার প্রতিটি প্রশ্নই গঠিত মানবিকতা, কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় আত্মার ভিতর থেকে।

তাঁর মৃত্যুর পর, দেশের প্রতি তাঁর রেখে যাওয়া শেষ চাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পরিবারের ন্যায় নিরাপত্তা। আর তাই, এখন এই রাষ্ট্রের সামনে তিনটি অনিবার্য প্রশ্ন।

প্রথমত, তাঁর দুই সন্তানের শিক্ষাজীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। বাবার শিক্ষা ছিল রাস্তায়, শ্রোগানে, রক্তমাখা বিশ্বাসে। সন্তানদের শিক্ষা হবে বইয়ের পাতায়, কলমের সঙ্গী হয়ে, কিন্তু সেই মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে থাকবে যেটা বাবা রেখে গেছেন। যেন তাঁরা শুধু বাবাকে না, ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে সামনে। এক সন্তান পড়াশোনা থামিয়ে দিয়েছে, আরেকজন স্কুলের পাঠে মন দিতে পারে না এ এক মিথ্যা বিচার হবে যদি তাদের ভবিষ্যৎ বাবার রক্তের মূল্যের সমান কিছু না পায়।

দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব ও পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সেটা হতে পারে একটি সরকারি অনুদান, বা এক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন আর কারো করুণা নয়, বরং সম্মানের ভিতর দিয়ে বাঁচার মতো জীবন। এমন প্রকল্প হতে পারে তাঁদের জন্য এক নতুন গৃহ, এক ছোট দোকান, কিংবা একটি সেলাই কেন্দ্র যা সেই পতিত পৃথিবীর ভেতর একটু আলো জ্বালিয়ে রাখবে। সারফুউদ্দিন উত্তরাধিকার রেখে গেছেন একটা দেশের কাছে, একটা ইতিহাসের কাছে। তাঁর উত্তরাধিকার কেবল তাঁর রক্তের ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটা ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার দাবিতে, চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তায়, এবং সেই সম্মানে যেটা একজন মানুষকে মানুষ করে তোলে মৃত্যুর পরেও। এই প্রস্তাবনা শুধু

তাঁর পরিবারের জন্য নয় এটা আমাদের বিবেকের জন্য, আমাদের রাষ্ট্রের অন্তঃস্থলে থাকা একটি নিরব প্রশ্নের জবাব “তোমরা কি নিজদের শহীদদের দেখেছো? না শুধু ব্যবহার করেছো?”

আজ সময় এসেছে সেই উত্তর দিয়ে দেওয়ার। যত দিন আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবো না, ততদিন আমরাও ইতিহাসের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : এস. এম সারফুউদ্দিন

পিতা : শরীফ মিয়া

মাতা : জাহেরা খাতুন

স্ত্রী : নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী)

সন্তান : দুই, এক মেয়ে ও এক ছেলে

(মেয়ে, পড়াশোনা বন্ধ রেখে মায়ের সেবায় নিয়োজিত, ছেলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি)

জন্ম : ২ মে, ১৯৬৯ (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী), জন্মস্থান ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : ৪৫, আজিজগঞ্জ, লালবাগ, ডাকঘর: ১২১১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বর্তমান ঠিকানা : হাউজ-৩৫, হাজী আবদুর রহিম শোকার সেনা, বংশাল, ঢাকা

পেশা : পেশা অনির্ধারিত,

শহীদ হওয়ার তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৪

শহীদ হওয়ার সময় : এশার নামাজের পর, রাতের বেলায়

শহীদ হওয়ার স্থান : নিজ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন

মৃত্যুর কারণ : গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু (□□□□□□ □□□□-□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□, সরকারি নথি অনুসারে)

চিকিৎসা সেবা ও ভেরিফিকেশন : ঢাকা সিভিল সার্জন অফিস, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্বারা মৃত্যু নিশ্চিত

দাফন ও জানাজা : স্থানীয় এলাকাবাসীর সহায়তায় সম্পন্ন হয়

শহীদদের কবরের অবস্থান : আজিমপুর কবরস্থান